



Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)

A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture

Volume - v, Issue - iii, Published on July issue 2025, Page No. 456 - 461

Website: <https://tirj.org.in>, Mail ID: info@tirj.org.in

(SJIF) Impact Factor 7.998, e ISSN : 2583 - 0848

বাংলা রূপকথার আড়ালে নারীমনের অব্যক্ত কিছুকথা

রাহুল মণ্ডল

গবেষক, বাংলা বিভাগ

সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ (স্বশাসিত), কলকাতা

Email ID : rahulju6542@gmail.com

Received Date 25. 06. 2025

Selection Date 20. 07. 2025

Keyword

Fairy tales,
metaphors, real life,
Women's social
status, Marital issues,
In-law conflicts,
Domestic violence
against women,
Women's criminal
tendencies, Mother's
infanticide,
Challenging social
myths, Women's
perspectives on
marriage.

Abstract

Fairy tales are intertwined with the sweet memories of human childhood. Due to the fantastical world and unrealistic characters presented in fairy tales, many consider them suitable only for children. However, upon closer inspection, it becomes clear that these stories often reflect real-life issues beneath their fantastical surface. In Bengali fairy tales, there is a close connection with women. The central themes of these tales revolve around women, and for centuries, women have primarily carried these stories forward through oral tradition.

In pre-colonial Indian society, women's basic rights, such as education, artistic expression, and personal freedom, were not recognized. Women were expected to remain under male dominance throughout their lives. Within this specific social context, women have left their mark on Bengali nursery rhymes, songs, folk tales, and fairy tales. These creative works express women's unspoken pain, exploitation, and oppression through metaphors.

This discussion focuses on selected Bengali fairy tales to explore women's social issues, their criminal tendencies, and their perspectives on society. The analysis highlights women's struggles, marital problems, and the establishment of personal identity within the societal framework.

Discussion

রূপকথার সঙ্গে মানুষের শৈশব জীবনের মধুর স্মৃতি জড়িয়ে রয়েছে। একবিংশ শতকে অবশ্য রূপকথার সঙ্গে বর্তমান প্রজন্মের সম্পর্ক খানিকটা শিথিল হয়ে এসেছে। বিগত দুই দশকে স্মার্টফোনের বাড়াবাড়ন্তের ফলে আট থেকে আশি সবাই এখন সোশ্যাল মিডিয়ার দুনিয়ায় মশগুল। অথচ এই স্মার্টফোনের যুগ শুরু হওয়ার আগে পর্যন্ত মা-ঠাকুমা-দিদিমার মুখে শোনা রাজা-রানী, রাজপুত্র-রাজকন্যা, রাক্ষস-খোক্ষস আর সোনারূপা-মণিমালিক্যের স্বপ্নরাজ্য শিশুদের মনে আনন্দ জুগিয়ে এসেছে। এই গল্পগুলির মধ্যে অবাস্তব জগৎ, অলৌকিক ঘটনা ও উদ্ভট চরিত্রের উপস্থিতির কারণে অনেকে রূপকথাকে প্রাপ্তবয়স্কের রসাস্বাদনের অনুপযোগী মনে করেন। আশুতোষ ভট্টাচার্য এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন, -

“লোককথা শিশুদের মনোরঞ্জনের জন্য রচিত হলেও তা পরিণত মনের সৃষ্টি।”



রূপকথার গল্পগুলিকে একটু তলিয়ে দেখলে বোঝা যাবে, এই আপাত অলৌকিকতার মোড়কে বাস্তবজীবন পরিবেশিত হয়েছে। এই গল্পগুলির মধ্যে এমন অনেক হিংসাত্মক ঘটনা রয়েছে যেগুলি শিশুমনের উপযোগী নয়। উদাহরণস্বরূপ ‘সাত ভাই চম্পা’ ও ‘কিরণমালা’ সদ্যোজাত শিশুহত্যার চেষ্টা, তিন বুড়ির গলা কাটা, সূঁচবিদ্ধ খলনায়িকার যন্ত্রণাময় মৃত্যু ইত্যাদি ঘটনার ভয়াবহতা শিশুর কল্পনাতেই হলেও, পরিণত বয়স্ক ব্যক্তি মাত্রই এগুলির বীভৎসতাকে সহজে অনুভব করতে পারবেন। আসলে বাস্তবজীবনে বঞ্চিত অবহেলিত মানুষেরা এই গল্পগুলির মধ্যে কল্পিত সুখ-সম্পদের আশ্বাদ অনুভব করেন। সমালোচকরা রূপকথার নির্দিষ্ট কিছু প্রবণতার ভিত্তিতে পুরুষের সৃষ্টি ও নারী সৃষ্টি গল্পের মধ্যে পৃথকীকরণ করেছেন। ছেলেদের নির্মিত রূপকথায় রাজপুত্র অনেক বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে রাজকন্যাকে উদ্ধার করে এবং গল্পের শেষে তাদের বিয়ে হয়। মেয়েদের সৃষ্টি গল্পের শুরুতেই নায়ক-নায়িকার বিয়ে হয়ে যায়। তারপর স্বামী বিপদগ্রস্ত হলে নায়িকা তাকে সেই বিপদ থেকে উদ্ধার করে।^১ মৌখিক পরম্পরায় এই গল্পগুলি বহু প্রজন্মের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। কথকের অভিজ্ঞতা ও সামাজিক পরিস্থিতি অনুযায়ী গল্পের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ের সংযোজন ও বিয়োজন ঘটেছে। ফলে রূপকথার প্রাথমিক কাঠামোটি লিঙ্গ বিশেষের সৃষ্টি হলেও, গল্পে ব্যবহৃত বিভিন্ন প্রসঙ্গ, চরিত্র ও মোটিফের মধ্যে নারী-পুরুষ উভয়ের প্রক্ষেপ ঘটেছে। এই গল্পগুলির সঙ্গে বাংলা নারীসমাজের ঘনিষ্ঠ যোগ রয়েছে। রূপকথার কেন্দ্রীয় ভাবনাগুলি আবর্তিত হয়েছে নারীকে কেন্দ্র করে। বাংলা লোককাহিনী সংগ্রহের প্রাথমিক প্রয়াস শুরু হয়েছিল ইউরোপীয় মিশনারিদের তরফে। লোককথার সংগ্রহের ক্ষেত্রে প্রথম স্মরণীয় বাঙালি নাম রেভারেন্ড লালবিহারী দে। তাঁর সংকলিত গ্রন্থ ‘Folktales of Bengal’ ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে লন্ডন থেকে প্রকাশিত হয়। তিনি জানিয়েছেন ছোটবেলায় এক বৃদ্ধার কাছে প্রথম এই গল্পগুলি শুনছিলেন।^২ প্রাচীন যুগ থেকে লালবিহারী দে’র কাল হয়ে বর্তমান সময় পর্যন্ত লোককথাগুলি মৌখিক পরম্পরায় মেয়েরাই বহন করে এসেছে। সেই হিসেবে এই গল্পগুলির কথক ও বাহক ছিলেন মুখ্যত মেয়েরা এবং এগুলি সৃষ্টির কৃতিত্বও অনেকাংশে তাদের।

উনবিংশ শতাব্দীর আগে পর্যন্ত মেয়েদের প্রথাগত শিক্ষাগ্রহণ এবং শিল্পসাহিত্য চর্চার অধিকার ছিল না। এজন্য লিখিত সাহিত্যের মধ্যে দিয়ে নারীর আত্মপ্রকাশের পথ বন্ধ ছিল। এইসময়ে সাহিত্যে নির্মিত নারীচরিত্র গুলি আসলে পুরুষের নারীসম্পর্কিত ধারণা ও উপলব্ধির প্রতিফলন। বাংলা সাহিত্যের আসরে মেয়েদের আবির্ভাব উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগে। ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত কৃষ্ণকামিনী দাসীর ‘চিত্তবিলাসিনী’ বাঙালি মেয়ের লেখা প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ।^৩ প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্যে নারীদের লেখা প্রায় অনুপস্থিত। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে চন্দ্রাবতী, রামী ধোপানী, মাধবী দাসী, গঙ্গামণি, রহিমুল্লাহ প্রমুখ মহিলা কবিরা ব্যতিক্রমী কিছু নাম। বাংলার আদি মহিলা কবি বলে পরিচিত রামমণি বা রামী ধোপানী একদা গ্রামবাসীদের রটানো অপবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে বলেছিলেন, -

“অবিচার দূরী দেশে আর না রহিবো/ যে দেশে পাষণ্ড নাই সেই দেশে যাব।”^৪

মেয়েদের বিরুদ্ধে এই ‘পাষণ্ড’দের অপবাদ ও লাঞ্ছনার ধারা উনিশ শতকেও অব্যাহত ছিল। বাংলাদেশের পুরুষতান্ত্রিক সমাজ মেয়েদের লেখাপড়ার সঙ্গে জুড়ে দিয়েছিল চরিত্রহীনতা ও অকাল বৈধব্যের ধারণা, -

“সেকালের বাঙ্গালা সমাজের নেতৃবৃন্দ মনে করিতেন, স্ত্রীলোকেরা লেখাপড়া শিখিলে চরিত্রহীনা ও বিধবা হইবে।”^৫

সমাজের কটাক্ষ, লাঞ্ছনা ও অপবাদকে অগ্রাহ্য করে মেয়েরা লেখাপড়া শিখেছে। নিজের অধিকার ও বঞ্চনার কথা বলার জন্যে কলম ধরে “নারীরা বলতে শুরু করেছেন নিজেদের কথা।”^৬ উনিশ শতকের আগে পর্যন্ত মেয়েমহলের বাইরে তাদের স্বাধীন মত প্রকাশের অবকাশ ছিল না। নারীর সাহিত্য সৃষ্টি ক্ষমতার নিদর্শন পাওয়া যাবে বাংলা লোককথা, ছড়া, গান, প্রবাদ, ব্রতকথা প্রভৃতির মধ্যে। বাংলা রূপকথার গল্পে অবলম্বনে নারীর জীবনযাপন, নিজস্ব উপলব্ধি, বঞ্চনা, শোষণ এবং সমাজকে দেখার দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশিত হয়েছে।

ভারতীয় স্মৃতিশাস্ত্রে বলা হয়েছে সন্তান জন্ম দেওয়ার জন্য স্ত্রীলোক সৃষ্টি এবং সন্তান উৎপাদনের জন্য পুরুষের।^৭ সাধারণত রূপকথার গল্পগুলি শুরু হয় রাজার সন্তানহীনতা বা আরও স্পষ্ট করে বললে পুত্রসন্তান না হওয়ার সমস্যা দিয়ে। বাংলা ছড়া, ব্রতকথা ও রূপকথার গল্পে জুড়ে এই পুত্রসন্তান লাভের আকাঙ্ক্ষা প্রবলভাবে ব্যক্ত হয়েছে। শাস্ত্রে বলা হয়েছে



সন্তান ধারণের জন্যে স্ত্রীলোক পূজনীয়। অর্থাৎ সন্তানধারণে অক্ষম নারীর অবস্থা ছিল এর ঠিক বিপরীত। ‘কলাবতী রাজকন্যা’ গল্পে সন্ন্যাসীর দেওয়া শিকড় বাটা ফুরিয়ে গেছে “দেখিয়া ছোটরাণী আছাড় খাইয়া মাটিতে পড়িলেন। ... ছোটরাণীর হাতের মাছ আঙ্গিনায় গড়াগড়ি গেল, চোখের জলে আঙ্গিনা ভাসিল।” এই বর্ণনাভঙ্গির মধ্যে খানিক অতিরঞ্জনের স্পর্শ থাকলেও ছোটরাণীর মানসিক যন্ত্রণাকে স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করে। তার এই যন্ত্রনা শুধুমাত্র সন্তান সুখ থেকে বঞ্চিত হওয়ার আশঙ্কায় নয়। বরং পুত্রসন্তান জন্ম দিতে না পারলে সামাজিকভাবে পতিত হবে, সেই আসন্ন বিপদের ভাবনাই তাকে ব্যাকুল করে তুলেছিল। গল্পের পরবর্তী দৃশ্যে ‘সোনা-র চাঁদ-’ পুত্র জন্ম দেওয়ায় পাঁচ রানীকে সমাজ জয়ডঙ্কা বাজিয়ে সমাদর করেছে এবং পেঁচা ও বানর জন্ম দেওয়ায় “ন-রাণী, ছোটরাণীকে কেহ জিজ্ঞাসাও করিল না।” বানর আর পেঁচা যদি বিকলাঙ্গ শিশুর প্রতীক হয়, তবে বিকলাঙ্গ শিশু জন্ম দিয়ে দুই রানী দাসী জীবনে পতিত হয়েছে। ‘সাত ভাই চম্পা’ গল্পের ছোটরাণীরও এইরকম পরিণতি ঘটেছে। ‘চন্ডীমঙ্গল কাব্যে’ খুল্লনার সঙ্গে বিবাহের কারণ হিসেবে ধনপতির যুক্তি ছিল লহনা তাকে পুত্র সন্তান দিতে পারেনি।^৯ বাস্তব জীবনে পুত্রসন্তান জন্ম দিতে অক্ষম হলে গৃহবধূর এভাবেই সংসারে স্থানচ্যুতি ঘটত।

অনেকসময় সাংসারিক অমঙ্গলের দায় গৃহবধূদের ঘাড়ে চাপিয়ে স্বামীর তাদের ত্যাগ করত। ‘শীত-বসন্ত’ গল্পে রাজ্যপাট হারিয়ে “রাজা আর সুয়োরানীর মুখ দেখিলেন না; রাজা বনবাসে চলে গেলেন।” সে যুগে নারী-পুরুষের সম্পর্কের মধ্যে আত্মিক বন্ধনের অভাবকে এই প্রসঙ্গগুলি স্পষ্ট করে দেয়। শাস্ত্রে নারীকে সম্মানের স্থানে বসানো হয়েছে। তবে নারীর সম্মান নির্ভর করত সমাজনির্মিত বিশেষ কিছু শর্তাবলীর ওপর। পতিসেবাই নারীর একমাত্র ধর্ম। পতি দুর্ভাগ্য, কামুক অথবা নির্ভগ্ন হলেও নারী তাকে দেবতার ন্যায় সেবা করবে।^{১০} যে নারী এই পরাধীনতার শর্ত নীরবে গ্রহণ করতে পারবে তিনি সম্মানের অধিকারী হবে। নারীর এই সহনশীলতার শর্তের ওপর স্বামীর প্রেমের মাত্রা নির্ভর করত। এজন্য ‘সাত ভাই চম্পা’ গল্পে সাত রানীর মধ্যে রাজা নরম স্বভাবের ছোটরাণীকেই বেশি ভালবাসত।

ভারতের লিঙ্গ বিভক্ত সমাজের পুত্র ও কন্যার স্থান পৃথক ছিল। সেযুগে মেয়েদের কদর যে শুধুমাত্র তাদের রূপের মূল্যে, সেই ভাবনারই প্রতিফলন ঘটেছে ‘দেড় আঙুলে’ গল্পে রাজকন্যা সম্পর্কে রাজার মন্তব্যে, “কানা কন্যা গেলেই বা কী।” কন্যাসন্তানের প্রতি অবহেলার দৃষ্টান্ত চোখে পড়ে ‘পাতার কন্যা মণিমালা’ গল্পে যখন রাজপুত্রের জীবনরক্ষার জন্য রাজকন্যার জীবনকে অনিশ্চয়তার মধ্যে ঠেলে দেওয়া হয়। পেঁচোরূপী মন্ত্রীপুত্রের প্রকৃত পরিচয় পেয়ে “রাজকন্যা নিঃশ্বাস ছাড়িয়া বাঁচিলেন।” গল্পের এই একটিমাত্র বাক্যের মাধ্যমে তার আসন্ন দুঃখ জর্জরিত ভবিষ্যতের আশঙ্কা ও যন্ত্রণা থেকে মুক্তিজনিত স্বস্তির অনুভূতিকে ব্যক্ত করেছে।

দাম্পত্য জীবনে স্বামীর অবহেলার পাশাপাশি নারীর অন্যতম যন্ত্রণার জায়গা ছিল সতীন সমস্যা। কৌলিন্য প্রথা দীর্ঘ বাংলাদেশে সতীন-কাঁটা থেকে জন্ম স্বেচ্ছা ব্রতের মধ্যে মেয়েরা নানাভাবে সতীনের মৃত্যু কামনা করেছে, -

“অশত তলায় বসত করি।/ সতীন কেটে আলতা পরি।।/ সাত সতীনের সাত কৌটা।/ তার মাঝে আমার এক অত্রের কৌটা।।/ অত্রের কৌটা নাড়ি চাড়ি।/ সাত সতীনকে পুড়িয়ে মারি।।”^{১১}

‘কলাবতী রাজকন্যা’, ‘শীত-বসন্ত’, ‘সাত ভাই চম্পা’, ‘লালকমল আর নীলকমল’ ‘সুখু আর দুখু’ প্রভৃতি গল্পে সতীনের প্রতি নারীর এই মনোভাব ও আচরণের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। লক্ষণীয় যে রূপকথার বেশিরভাগ গল্পে খলচরিত্রের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে দেখা যায় স্ত্রীলোকদেরই। গল্পের শুরুতে জটিলতা তৈরি হয় রানীর সপত্নী, রাজপুত্রের সৎমা অথবা রানীর রূপধারী রাক্ষসীর দ্বারা। রাজকন্যা লাভের অভিযানে রাজপুত্রের সামনে বাধা হয়ে দাঁড়ায় তিন বুড়ির রাজ্যের ডাইনি, পাশাবতীর রাক্ষসীরা। আসলে বাস্তব জীবনে পুরুষতান্ত্রিক মূল্যবোধে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নারীদের দ্বারাই গৃহবধূরা সবচেয়ে বেশি নির্যাতিত হয়ে এসেছে। রূপকথার সুয়োরানী বাঙালির একান্নবর্তী পরিবারে সতীনের সঙ্গে কলহ, শাশুড়ি ও ননদের গঞ্জনা, অত্যাচারের প্রতীকী রূপ। অন্তঃপুরের এই দুয়োরানীরাই সে যুগে মেয়েদের যন্ত্রণার অন্যতম কারণ ছিল, তার ইঙ্গিত রয়েছে ‘চন্ডীমঙ্গল কাব্যে’ কালকেতুর বয়ানে, -

“সাসুড়ি ননদি নাঞি নাঞি তোর সতা/ কা সনে কন্দল করিচক্ষু কৈলে রাতা।”^{১২}



পণপ্রথা অথবা বধুদের নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্যে স্বামী ও শাশুড়ি কর্তৃক শারীরিক নিগ্রহের ঘটনা গ্রামবাংলার সমাজে বিরল ছিল না। শিশুদের জন্য নির্মিত গল্পে সঙ্গত কারণেই শারীরিক নিগ্রহের বিষয়ে মেয়েরা নীরব। এই শারীরিক নির্যাতন অনেক ক্ষেত্রে যে গৃহবধুর মৃত্যুর কারণ হত, তার ইঙ্গিত রয়েছে ‘লালকমল আর নীলকমল’ গল্পে রাক্ষসীর দৃষ্টিতে লক্ষ্মীরানীর শয্যাশায়ী হয়ে মৃত্যু অথবা ‘শীত-বসন্ত’ গল্পে সুয়োরানীর ওষুধের প্রভাবে দুয়োরানির পাখি হয়ে উড়ে যাওয়ার রূপকের মধ্যে।

রূপকথার একাধিক গল্পে নানা হিংসাত্মক ঘটনার সূত্রে উঠে এসেছে নারীমনের অপরাধ প্রবণতা দিকটি। আদিম জীবনযাপনের সময় থেকে অপরাধের সঙ্গে মানুষের ঘনিষ্ঠ যোগ তৈরি হয়েছিল। বহু বিশেষজ্ঞ মনে করেন সামাজিক অবক্ষয় ও ব্যক্তির বঞ্চনা অপরাধের জন্ম দেয়।^{১৩} প্রাচীন ভারতবর্ষের বাল্যবিবাহ, কৌলিন্য প্রথার মতো নীতিভ্রষ্ট কুপ্রথার প্রভাবে নারীর প্রতি বঞ্চনা ও অত্যাচারের সীমা ছিল না। এদেশের রক্ষণশীল সমাজ নারীর শিক্ষার অধিকার, ব্যক্তি স্বাধীনতা, বিবাহবিচ্ছেদ, পুনর্বিবাহের মতো মৌলিক অধিকার গুলিকে অস্বীকার করে সামাজিকভাবে তাদের কোণঠাসা করে রেখেছিল। এই আত্মসংকট থেকে মুক্তির উপায় হিসেবে মেয়েরা অনেকক্ষেত্রে অপরাধের পথ বেছে নিয়েছে। বাঙালির অন্তঃপুরে নারীঘটিত কিছু অপরাধের প্রসঙ্গ রূপকথায় প্রতীকের আড়ালে প্রকাশিত হয়েছে। ‘শীত-বসন্ত’ গল্পে সুয়োরানীর ওষুধের প্রভাবে দুয়োরানীর পাখি হয়ে উড়ে যাওয়ার প্রসঙ্গটি আসলে বিষয়প্রয়োগ করে হত্যার প্রতীকী রূপ। ‘লালকমল আর নীলকমল’ গল্পে রাক্ষসরানীর রক্ত চুষে খাওয়ার ফলে লক্ষ্মীরানীর শয্যাশায়ী হয়ে মৃত্যুর প্রসঙ্গটি অন্তঃপুরে গোপনে বধু হত্যার রূপক। বাঙালির অন্দরমহলে নারীর ওপর পারিবারিক নিগ্রহ, গর্ভপাত, বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কের জেরে হত্যা প্রভৃতি ঘটনা সাধারণ বিষয় ছিল। প্রাচীনযুগ থেকে উনিশ শতক পর্যন্ত, গ্রাম বাংলার এই সামাজিক চিত্রের বিশেষ পরিবর্তন ঘটেনি। দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় এক ব্রাহ্মণ বিধবার অস্বাভাবিক মৃত্যুর কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে জানতে পারেন পরিবারের সদস্যরাই তাকে প্রয়োগ করে হত্যা করেছে অবৈধ গর্ভসঞ্চারণের কারণে। অনুসন্ধান করে তিনি জানতে পারেন বিগত দশ বছরে সেই গ্রামে আরও ৩০-৩২ জন বিধবার একই পরিণতি ঘটেছিল।^{১৪} সতীনের পাশাপাশি কৌলিন্য প্রথাপিড়িত নারীদের ক্ষোভের শিকার হত সতীনের ছেলেমেয়েরাও। সতীনের ওপর আক্রোশবশত তার সন্তানদের ওপর লাঞ্ছনা, অবহেলা ও শারীরিক নিগ্রহের দৃষ্টান্ত দেখা যায় ‘কলাবতী রাজকন্যা’ ও ‘শীত-বসন্ত’ গল্পে। সুখের কাঁটা দূর করার জন্য মেয়েরা শিশু হত্যার মতো নির্মম ঘটনার দৃষ্টান্ত রেখেছে ‘সাত ভাই চম্পা’ গল্পে। এই নৃশংস আচরণের পশ্চাতে মেয়েদের ব্যক্তিগত তাড়নার সঙ্গে সামাজিক বৈষম্যের প্রভাবকে পুরোপুরি অস্বীকার করা যায় না। যদিও সামাজিক বঞ্চনার তত্ত্ব দিয়ে শিশুহত্যার মতো নির্মম ঘটনা কোনভাবেই সমর্থনযোগ্য নয়।

সামাজিক অবদমনের বিপরীতে মেয়েদের আপন স্বভাব বশত অপরাধে লিপ্ত হওয়ার নিজের দেখতে পাওয়া যায় রূপকথায়। ‘কিরণমালা’ গল্পে ছোটবোনের সুখ আর ঐশ্বর্য দেখে বড় বোনেরা নিজেদের ইচ্ছেমতো জীবন পেয়েও সুখী হতে পারেনি। বোনের প্রতি ঈর্ষাবশত তার সদ্যোজাত শিশুদের হত্যার চেষ্টা করেছে। ‘শীত-বসন্ত’ গল্পে ছলনার আশ্রয় নিয়ে সুয়োরানী সতীনপুত্রদের হত্যার পথ প্রশস্ত করেছে। এমনকি ‘লালকমল আর নীলকমল’ গল্পে গর্ভজাত সন্তান বিরুদ্ধাচরণ করায় রানীরূপী রাক্ষসী আপন সন্তানকে পর্যন্ত হত্যা করেছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য রূপরাম চক্রবর্তীর ‘ধর্মমঙ্গল কাব্য’-এ শিবা বারুই-এর স্ত্রী নয়নী লাউসেনের প্রেমে প্রত্যাখ্যাত হয়ে, প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য সদ্যোজাত সন্তানকে হত্যা করে, তার দায় লাউসেনের ওপর চাপিয়েছে।

“নয়নী চিন্তিল মনে কি বুদ্ধি করিব।/ এ হেন নাগরে মিছে অপবাদ দিব।।/ কুয়ায় ফেলিব শিশু এহার লাগিয়া।/ বন্দিখানা দিব আজি এ বুদ্ধি করিয়া।।/ পাসরিব পুত্রশোক দেখিলে এহারে।/ ফুলের বালক পথে আছাড়িয়া মারে।।/ ঘাড় মোচড়াইয়া শিশু ফেলিল কুয়ায়।/পরিত্রাই ডাকে মাগী চরিপনে চায়।।”^{১৫}

প্রতিশোধস্পৃহায় অন্ধ স্ত্রীলোকের পক্ষে বাস্তবে নিজের সন্তান হত্যার ঘটনা অসম্ভব ছিল না। এই ধরনের সন্তান হত্যাকারী চরিত্রই রূপকথার গল্পে রাক্ষসী রূপককে প্রতিফলিত হয়েছে। অপরাধমনস্কতা কোনো লিঙ্গবিশেষের প্রবণতা নয়, তা মানুষমাত্রেই আদিম প্রবৃত্তি। প্রত্যেক ব্যক্তি আদিম যুগ থেকে মনের অবচেতন গহনে একে বহন করে চলেছে। রূপকথার গল্পে এই ধরনের অপরাধের উল্লেখ মেয়েদের সমাজ সচেতন নিরপেক্ষ মনকেই তুলে ধরেছে।



ঊনবিংশ শতাব্দীতে মেয়েরা সমাজের আপত্তিকে অগ্রাহ্য করে বিদ্যালয়ে গিয়ে লেখাপড়া শিখেছে, স্বাধীন মত প্রকাশের জন্য জন্য কলম ধরেছে। এই সামাজিক অগ্রগতির যাত্রায় একশ্রেণির পুরুষের সমর্থন থাকায় তাদের পথ খানিক সুগম হয়েছিল। মেয়েদের লেখা প্রকাশিত হওয়ার পর তাদের বিরুদ্ধে ধেয়ে এসেছিল প্রাচীনপন্থীদের নানা তীর্থক কটুক্তি। সামাজিক নিন্দা ও ব্যক্তি আক্রমণকে এড়িয়ে যাওয়ার জন্য সেই সময়কার বহু লেখিকা ছদ্মনামে লেখা প্রকাশ করতেন।^{১৬} প্রাক ঔপনিবেশিক সমাজে মেয়েদের অধিকারের জন্য পুরুষের কোনো সমর্থন ছিল না। রূপকথার গল্পগুলির মধ্যে তাই প্রতীকের আড়ালে, নির্বাচিত কয়েকটি শব্দের প্রয়োগ করে মেয়েরা নিজেদের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও মতামত গুলি ব্যক্ত করেছে। ‘কলাবতী রাজকন্যা’ গল্পে “রাজকন্যা, এখন তুমি কা’র?” বন্ধুর এই প্রশ্নের উত্তরে রাজকন্যা বলেছে, “আগে ছিলাম বাপের-মায়ের, তা’র পরে ছিলাম আমার; এখন তোমার।” স্মৃতিশাস্ত্রে বলা হয়েছে স্ত্রীলোক কুমারী জীবনে পিতা, যৌবনে, স্বামী ও বার্ষিক্যে পুত্রের দ্বারা রক্ষিত; স্ত্রীলোক স্বাধীনতার যোগ্য নয়।^{১৭} ভারতের রক্ষণশীল সমাজ নারীর ব্যক্তি স্বতন্ত্র্যকে স্বীকার করেনি। এই বিশেষ সমাজ কাঠামোর মধ্যে দাঁড়িয়ে রাজকন্যা পিতা ও স্বামীর প্রতি আনুগত্যের জায়গা স্বীকার করেও তার স্বাধিকারের জায়গাটিকে স্পষ্ট করে দিয়েছে।

পুরুষতান্ত্রিক সমাজের কিছু সাধারণীকৃত ধারণা হল মেয়েদের বুদ্ধি কম, স্বভাবগতভাবে দুর্বল এবং আত্মরক্ষায় অক্ষম। প্রাচীন শাস্ত্রে মন্ত্রণালয় থেকে জড়বুদ্ধি, কালা, অন্ধ, বৃদ্ধ এবং নারীকে অপসারণের কথা বলা হয়েছে।^{১৮} রূপকথার দুয়োরানীরা সমাজ পরিকল্পিত নারী চরিত্রের প্রতিনিধি, যারা বিরূপ পরিস্থিতিকে নিয়তি বলে স্বীকার করে নিয়ে যাবতীয় যন্ত্রণা নীরবে সহ্য করে। আবার রূপকথার গল্পে এর ঠিক বিপরীতধর্মী নারী চরিত্রের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। ‘কলাবতী রাজকন্যা’ ও ‘পাতাল কন্যা মণিমালা’ গল্পে বন্দী হয়ে রাজকন্যারা বিচলিত হয়নি, কোনোরকম কাকুতি-মিনতি করেনি কিংবা নিয়তিকে দোষ দেয়নি। কৌশলে নিজের পণের কথা জানিয়ে পরিস্থিতি বদলের অপেক্ষা করেছে। ‘সোনার কাটি রূপার কাটি’ গল্পে রাজকন্যাই কৌশলে রাক্ষসদের পরাজিত করার উপায় জেনে নিয়েছে। ‘সাত ভাই চম্পা’ গল্পে ভাইদের বিপদের কথা জানার পর কিরণমালা “কাঁদিলো না কাটিলো না”, ধীরভাবে ঘরের কাজ সামলে, পথের যাবতীয় বাধা-বিপত্তি অতিক্রম ক’রে ভাইদের উদ্ধার করে এনেছে। আসলে রূপকথার এই চরিত্রগুলি নির্মাণের মধ্যে দিয়ে মেয়েদের ওপর আরোপিত পুরুষতান্ত্রিক মিথ গুলিয়ে খন্ডন করেছে।

আদিম যুগ থেকে পুরুষের মধ্যে জোর করে নারীকে অধিকার করার প্রবণতা কাজ করে। ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’ কাব্যের কৃষ্ণ চরিত্রে, ‘মৈমনসিংহ গীতিকার’ কাজী, দেওয়ান প্রভৃতি চরিত্রের মধ্যে এই বিশেষ মনোভাবের প্রকাশ ঘটেছে। এর বিপরীতে রূপকথায় রাজপুত্ররা নানা বাধা-বিপত্তি অতিক্রম ক’রে, রাজকন্যার পণ পূরণ করার পর তাদের প্রেমের অধিকারী হয়েছে। বলপ্রয়োগ করে অথবা ভয় দেখিয়ে নারীর প্রেম ও আনুগত্য লাভ করা যায় না, এই গল্পগুলির মধ্যে দিয়ে মেয়েরা সেই ভাবনাকেই ব্যক্ত করেছে। এজন্য ‘পাতাল কন্যা মণিমালা’ ও ‘কলাবতী রাজকন্যা’ গল্পে রাজকন্যাকে বন্দী করেও রাজপুত্র শেষ পর্যন্ত তাদের উদ্দেশ্যে সফল হতে পারেনি।

প্রেম ও দাম্পত্য নিয়ে নারীর একটি বিশেষ আকাঙ্ক্ষার কথা রূপকথার গল্পে বারবার ফিরে এসেছে। সতীন সমস্যায় পীড়িত নারীদের অন্যতম কামনা ছিল স্বামীর একমাত্র পত্নী হওয়ার। এই বিশেষ ইচ্ছের প্রতিধ্বনি শোনা যায় কুমারীদের হরিচরণ ব্রতের মধ্য, -

“হরির চরণ হরির পা, হরি বলেন ওগো মা।/ আজ কেন মা পা’টি শীতল, কোন রমণী পুজছে মা বন্।/ সে যুবতী কি চায় বর, চায় বুঝি তার মনোমত বর।/ রামের মতো স্বামী পাবে, লক্ষণের মতো দেবর হবে।...”^{১৯}

বহুবিবাহের যুগে আজীবন এক পত্নীতে আনুগত্য রামচন্দ্রই মেয়েদের কাঙ্ক্ষিত পুরুষ। এজন্যে রূপকথার বেশিরভাগ গল্পে রাজার একাধিক রানী থাকলেও রাজপুত্র সবসময় একজন রাজকন্যাকেই বিয়ে করেছে। গল্পে শুরুতে রাজার দুই, চার অথবা সাত রানী থাকলেও, গল্পে শেষে রাজা সবসময় একজন রানীকে নিয়েই সুখে দিন যাপন করেছে। সুখী দাম্পত্যের জন্য একজন নারী ও একজন পুরুষের উপস্থিতি কাম্য, সতীন সমস্যায় জর্জরিত মেয়েরা রূপকথার গল্পগুলির মধ্যে নীরবে তাদের এই দাম্পত্য ভাবনাকেই ব্যক্ত করেছে।

**Reference:**

১. ভট্টাচার্য, শ্রী আশুতোষ, বাংলার লোক-সাহিত্য (প্রথম খণ্ড), ক্যালকাটা বুক হাউস, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ : ১৯৬২, পৃ. ৪৫৫
২. গিরি, সত্যবতী ও মজুমদার, সমরেশ (সম্পাদিত), প্রবন্ধ সঞ্চয়ন (প্রথম খণ্ড), 'বাংলা লোকসাহিত্যে নারীদের স্থান এবং দান', অপু দাস, রত্নাবলী, কলকাতা, চতুর্থ সংস্করণ : মে ২০১৯, পৃ. ১৩৮
৩. চক্রবর্তী, বরণকুমার, বাংলা লোকসাহিত্য চর্চার ইতিহাস, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, অষ্টম সংস্করণ : জুলাই ২০২০, পৃ. ৪৭০
৪. গুপ্ত, চিত্ররেখা, উনিশ শতকের বিস্মৃত লেখিকারা সঞ্চয় ও সংশয়, উর্বা প্রকাশন, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৪, পৃ. ১১
৫. বন্দোপাধ্যায়, সুমন্ত, উনিশ শতকের কলকাতা ও সরস্বতীর ইতর সন্তান, অনুষ্টুপ প্রকাশনী, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৩, পৃ. ১৭৩
৬. চৌধুরী, সঞ্জমিত্রা, আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মহিলা রচিত রচনার ক্রমবিকাশ, ১৮৫০-১৯০০, বোনা, কলকাতা, নভেম্বর ২০০০, পৃ. ১৮
৭. গুপ্ত, চিত্ররেখা, উনিশ শতকের বিস্মৃত লেখিকারা সঞ্চয় ও সংশয়, উর্বা প্রকাশন, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৪, পৃ. ৯
৮. বন্দোপাধ্যায়, সুরেশচন্দ্র, মনুসংহিতা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, জানুয়ারি ১৯৯৯, পৃ. ২৫৮
৯. সেন, সুকুমার (সম্পাদিত), কবিকঙ্কন মুকুন্দ বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল, সাহিত্য অকাদেমি, কলকাতা, ২০২২, পৃ. ১২০
১০. বন্দোপাধ্যায়, সুরেশচন্দ্র, মনুসংহিতা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, জানুয়ারি ১৯৯৯, পৃ. ১৬২
১১. ভট্টাচার্য, শ্রী আশুতোষ, বাংলার লোক-সাহিত্য (প্রথম খণ্ড), ক্যালকাটা বুক হাউস, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ: ১৯৬২, পৃ. ১৮৫
১২. সেন, সুকুমার (সম্পাদিত), কবিকঙ্কন মুকুন্দ বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল, সাহিত্য অকাদেমি, কলকাতা, ২০২২, পৃ. ৬২
১৩. মিত্র, শ্রীপর্ণা ও মন্ডল, অরূপ (সম্পাদিত)। অশ্বেষা: 'বাঘবন্দী খেলা', 'বিচ্যুতি, অপরাধ এবং সামাজিক নিয়ন্ত্রণ' এষণা, কলকাতা, মার্চ ২০২৪, সম্পাদকীয়।
১৪. সুর, নিখিল, সেকালের অপরাধ জগৎ, আশাদীপ, কলকাতা, জানুয়ারি ২০২২, পৃ. ২০৮
১৫. চক্রবর্তী, রুপরাম, ধর্মমঙ্গল, ভারবি, কলকাতা, ডিসেম্বর ২০২৩, পৃ. ২০৬
১৬. বিশ্বাস, অদ্রীশ (সম্পাদিত), মনোত্তমা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১১, পৃ. ২৭
১৭. বন্দোপাধ্যায়, সুরেশচন্দ্র, মনুসংহিতা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, জানুয়ারি ১৯৯৯, পৃ. ১৬২
১৮. বন্দোপাধ্যায়, সুরেশচন্দ্র, মনুসংহিতা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, জানুয়ারি ১৯৯৯, পৃ. ১৯২
১৯. ভট্টাচার্য, শ্রী আশুতোষ, বাংলার লোক-সাহিত্য (প্রথম খণ্ড), ক্যালকাটা বুক হাউস, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ: ১৯৬২, পৃ. ১৮৮